দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ঃ প্রবর্তনের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ও রক্ষার আন্দোলন

ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী
চেয়ারম্যান, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে আইনে শাসিত হয় সে আইন অর্জিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থানের পরিবেশে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ নামে পরিচিত। এ আইন হঠাৎ করে একদিনে প্রবর্তিত হয়নি কিংবা কোন ব্যক্তির খেয়াল খুশিতেও রচিত হয়নি। এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘ বার বছরের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। ১৯৭৩ আদেশ পূর্ববর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাসিত হয়েছে ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত এক আইন দ্বারা যা ১৯৬১ সালের কালাকানুন (Black laws of 1964) নামে সমধিক পরিচিত। ১৯৬১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ছিল সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী। এ আইন নানাভাবে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর কন্ঠরোধ করার প্রয়াস পেয়েছিল, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছিল এবং শিক্ষার পরিবেশকে করেছিল কলুষিত। মুক্তচিন্তা ও বাক স্বাধীনতা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার পূর্বশর্ত। ১৯৬১-এর কালাকানুনে এর কোন অবকাশ ছিল না। এই কালাকানুন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারকে এবং তার প্রতিনিধি ভাইস-চ্যান্সেলারকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকার দিয়ে রাখে যার যথেচ্ছা প্রয়োগ আমরা ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখতে পাই।

ষাটের দশকে এ দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল স্বৈরাচারী সামরিক শাসক ও সামরিক শাসনের আবরণে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার এবং '৬১-এর কালাকানুন এই শাসক গোষ্ঠীকে দিয়েছিল সর্বময় ক্ষমতা। আর এই সুবাদে তদানীন্তন স্বৈরাচারী সামরিক শাসক গোষ্ঠী এবং তাদের অনুচরেরা নিজেদের স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছিল এবং তাদের স্বার্থসিদ্ধির ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় নেমেছিল। সেই পরিবেশ জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের পরিপন্থী ছিল। মৌলিক গবেষণা ও শিক্ষা সেই অবস্থায় সম্ভব ছিল না। '৬১-এর আইন এতই অগণতান্ত্রিক ছিল যে, এর বিধান অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় যে কোন অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক বা কর্মচারীকে শাস্তি দিতে পারত। যেমন এই আইনে বলা ছিল "যদি কোন শিক্ষক অথবা কর্মচারী কোনরূপ নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়িত আছে বলে সন্দেহ হয় যা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের পরিপন্থী এবং নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়িত এমন কারো সংগে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক অথবা কর্মচারী যুক্ত আছে বলে সন্দেহ হয় তাহলে তাকে/তাদেরকে চাকুরীতে বহাল রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে" (Second statue D.U.O, 1961) এই আইনে আরো বলা হয়, "যদি কোন শিক্ষক বা কর্মচারী উপাচার্যের লিখিত পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে বাইরের কোন সংগঠনের সাথে জড়িত হয় তাহলে সেটা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।', এই আইন এতই নগ্ন ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশের কোন আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়ারও অধিকার কোন শিক্ষকের ছিল না। অতএব, এই আইনের বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীকে শৃংখলিত করে রেখেছিল। এটা ছিল শিক্ষকদের জন্য এক ধরনের দাসত্ব। বলা বাহুল্য, এই পরিবেশে মুক্ত জ্ঞান চর্চা, বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না; বরঞ্চ শিক্ষক-কর্মচারী চাকুরীর নিরাপত্তা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে এক অসহায় জীবন যাপন করছিল।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৬১-এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন বাতিলের দাবী ওঠে। পুরো ষাটের দশকে এই দেশের সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তি এই আইনের সমালোচনায় মেতে উঠে। ষাটের দশকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে স্বৈরাচার বিরোধী যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তার একটি দাবী ছিল ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের কালাকানুন বাতিল করা। বিশেষ করে এই দশকে যে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার একটি অন্যতম প্রধান দাবী ছিল এই কালাকানুন বাতিল করা। তদানীন্তন স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী এই আন্দোলনকে ফ্যাসিবাদী কায়দায় নস্যাৎ করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু শত নির্যাতনের মুখেও সংগ্রামী ছাত্র সমাজ তাদের এই আন্দোলন চালিয়ে যায়। ষাটের দশকের শেষ ভাগে ছাত্ররা যে এগার দফা আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে তার একটি প্রধান দফা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন বাতিল করা। ছাত্রদের এই প্রতিরোধ আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুংথানের সাথে এবং ১৯৭১ এর স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে একীভূত হয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজও ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এই দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৯৬৬-৬৭ সালে এই দাবী উংথাপিত হলে ও ১৯৬৯ সাল নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানন বাতিলের দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সংগঠিত হয় এবং এই লক্ষ্য অর্জনে একটি সংগঠিত আন্দোলন পরিচালনার সংকল্প ঘোষণা করে। ১৯৬৯-৭০ সালে এই আইন বাতিল করে একটি গণতান্ত্রিক আইন প্রবর্ত[illegible] দাবী ক্রমশ: শক্তিশালী [illegible] উঠে। এই দাবীতে সেই [illegible] শিক্ষকেরা সংবাদপত্রে বিবৃ[illegible] প্রদান, সভা, মিছিল প্রভৃ[illegible] কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। দেশের তৎকালীন বিরাজমান পরিস্থিতিতে তথা তখনকার গণআন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ইত্যাদির সাথে শিক্ষকদের আন্দোলনও সংযুক্ত হয়ে যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এই দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নবগঠিত সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। শিক্ষক সমিতি ১৯৭২-এর ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণার দাবী জানায় এবং উক্ত তারিখের মধ্যেই সরকার '৬১-এর কালাকানুন বাতিলের কথা ঘোষণা করে এবং নতুন আইন প্রবর্তনের জন্য কমিটি গঠন করে। তদানীন্তন শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নতুন গণতান্ত্রিক আদেশ প্রবর্তিত হয়।

১৯৭৩ আদেশের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্জন করেছে স্বায়ত্তশাসন। অর্থাৎ এর মাধ্যমে কল্পনা করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্বশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বাইরের হস্ত[illegible]ক্ষপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশকে বিঘ্নিত করবে না। বিশ্ববিদ্যালয় অনেকাংশে থাকবে সরকারী প্রভাবমুক্ত। বস্তুত: ১৯৭৩ এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্রদের মুক্তি সনদ বলা যেতে পারে। এই আদেশের ফলে শিক্ষক কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে।

১৯৭৩ এর আদেশ অনুযায়ী চ্যান্সেলার আগের মত সরাসরি উপাচার্য নিয়োগ করতে পারেন না। এই আইনের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট তিন সদস্য বিশিষ্ট উপাচার্যের একটি প্যানেল নির্বাচন করে এবং এই প্যানেল থেকে একজনকে চ্যান্সেলার উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেন। এই আইন উপাচার্যের নিয়োগ প্রসংগে চ্যান্সেলারের অবাধ ক্ষমতা রহিত করে এবং তিনি যাকে খুশী তাকে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দিতে পারেন না। তার পছন্দ ঐ তিন সদস্য বিশিষ্ট প্যানেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ সরকার প্রধানই চান্সেলার থাকেন এবং সমসাময়িককালে আমাদের দেশের সরকারের চরিত্র যেখানে অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী সেখানে এই আইন নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসনের রক্ষাকবচ।

১৯৭৩ এর আদেশ উপাচার্যকে আগের মত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে রাখেনি তার বেশ কিছু ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে, যেমন ফিন্যান্স কমিটির সভাপতি উপ-উপাচার্য অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত অনেক সিদ্ধান্তগুলির সাথে উপাচার্যের সরাসরি যোগাযোগ নেই। তাতে তার প্রশাসনিক দায়িত্ব যেমন কিছুটা লাঘব হয়েছে তেমনি ক্ষমতারও বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ এখন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। যেমন বিভিন্ন অনুষদের ডীন নিয়োগ। ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপাচার্য তার খুশীমত ডীন নিয়োগ করতেন। কিন্তু '৭৩-এর আদেশ প্রবর্তনের পর থেকে প্রতিটি অনুষদের অন্তর্গত শিক্ষকেরাই তাদের নিজস্ব ডীন নির্বাচন করে থাকেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডীন নিয়োগের ফলে শিক্ষকগণ শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এছাড়াও বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সিনিয়রিটির ভিত্তিতে তিন বৎসর মেয়াদী নিয়োগ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যা শিক্ষা ও গবেষণার দ্বার প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে। পূর্বের (১৯৬১) আইন অনুযায়ী একজন শিক্ষকের সারাজীবন চেয়ারম্যানের পদে বহাল থেকে স্বার্থান্বেষী মহলকে শক্তিশালী করার কৌশল আজকের দিনে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। চেয়ারম্যান পরিবর্তনের প্রথা ব্যক্তি শিক্ষককে নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় জ্ঞান অন্বেষণের সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়া ১৯৬১-এর শিক্ষক-কর্মচারীর শৃংখলা সংক্রান্ত ষ্টাটিউট বাতিলের মধ্য দিয়ে বর্তমানে শিক্ষক কর্মচারীকে যে কোন অজুহাতে চাকুরীচ্যুত করার ষড়যন্ত্রকে নস্যাত করা হয়েছে। ১৯৭৩-এর আদেশ তাই শিক্ষক কর্মচারীর চাকরির নিরাপত্তা বিধান করেছে। এই আইন পুলিশের রিপোর্টে চাকুরী হারানোর ভয় থেকে শিক্ষকদের মুক্তি দিয়েছে। এই আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীকে তার রাজনৈতিক অধিকারেরও নিশ্চয়তা দিয়েছে; যেমন যে কোন শিক্ষক কর্মচারী এখন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারেন এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারেন যা এই আইন প্রবর্তনের আগে সম্ভব ছিল না। সিনেট, সিণ্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলে শিক্ষকের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রয়েছে এই আইনে। এতে ছাত্রদের স্বার্থে তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে নীতি নির্ধারণে ও আইন প্রণয়নে শিক্ষকগণ এখন অংশগ্রহণ করতে পারছেন। সিনেটে শুধু শিক্ষকই নয়, ছাত্র এবং অভিভাবকদেরও অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। মোটকথা ১৯৭৩-এর আইন সর্বক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক আদর্শ সমুন্নত রেখেছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক বিকাশের জন্য, বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার জন্য এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

১৯৭৩-এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ প্রবর্তনের পর থেকেই এদেশের মহল বিশেষ এই আদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য এই গণতান্ত্রিক আদেশের স্থলে পূর্ববর্তী অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী অধ্যাদেশ জারি করা। স্বার্থান্বেষী মহল তাই ছলে-বলে কৌশলে সময় ও সুযোগমত এর উপর হামলা চালিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও চালাবে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাগ্রত সংগ্রামী শিক্ষক-কর্মচারী-ছাত্র সমাজ '৭৩-এর আদেশের উপর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সদা প্রস্তুত।

১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ১৯৭৩-এর আইনের উপর সরকারী হামলা জোরদার হয়। এই আইনের সংশোধন করে ডীন নির্বাচন শুধুমাত্র অধ্যাপকদের মধ্যে

(১০-এর পাতায় দেখুন)

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 FEB 1987
পৃষ্ঠা